ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1963-1969
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.421

পরিবেশ নীতিবিদ্যা ও গভীর বাস্তুবাদ: প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মূল্যের এক দার্শনিক পর্যালোচনা

রীনা পাল, *স্বাধীন গবেষক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 30.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Environmental Ethics has emerged as an important philosophical branch, which extends human moral responsibility not only to the human-centered sphere but also to the entire world. Deep Ecology, pioneered by Arne Naess, places particular importance on the concept of the intrinsic value of nature. Deep ecology holds that nature is valuable not only for its usefulness to humans, but also for its own existence. This view challenges the conventional anthropocentric view and emphasizes the biocentric and ecocentric perspectives. This paper will analyze the core tenets of deep ecology in the light of environmental ethics and explore its philosophical basis for establishing the intrinsic value of nature. Deep ecology opposes anthropocentrism and argues for biocentrism and ecocentrism. It calls for humans to unite with nature through the concepts of biospherical egalitarianism and self-realization. According to this view, moral responsibility towards nature is not only to protect human interests, but also to respect the existence and development of all living things. This paper will analyze the basic theories of deep ecology in the light of environmental ethics and review its philosophical foundations and relevance in establishing the intrinsic value of nature.

Keywords: Environment, Deep Ecology, Anthropocentrism, Intrinsic Value, Non-human Beings, Self-realization

পরিবেশ নীতিশাস্ত্রের আলোচনায় কেবল মানুষ বা প্রাণবান সত্তাই নয়, জড়-জগত, প্রজাতি ও বাস্তুব্যবস্থারও নৈতিক মূল্য স্বীকার করা হয়। যেখানে মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ ইত্যাদির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং পরিবেশের জৈব ও অজৈব উপাদানসমূহের মধ্যে সেই সুনিয়ন্ত্রিত মিথস্ক্রিয়ার সম্পর্ক আছে, তাকেই বাস্তুবিজ্ঞান বলে। এই বাস্তু বিজ্ঞানের সাথে সঙ্গতি রেখে পরিবেশ চিন্তার জগতে যেসব সমগ্রতাবাদী নীতিতত্ত্ব বা পরিবেশ দর্শনের উদ্ভব হয়েছে, তাকেই বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদ বলে। এই বাস্তুতন্ত্রে, প্রত্যেক সত্ত্বাই এক মিথোজীবিতার সম্পর্কে একে অন্যের ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। এই পারস্পরিক ভারসাম্যের ওপরেই এই পরিবেশের সুস্থিতি নির্ভর করে। আমরা যদি শুধুমাত্র কোনো একটি প্রাণীর দুঃখ-যন্ত্রণা নিয়ে ভাবতে থাকি, তাহলে এই প্রকৃতির সংরক্ষণ সাধন সম্ভব হবে না। অল্‌ডো লিওপোল্ডের মতে, নীতিতত্ত্বের সম্প্রসারণ আসলে বাস্তুতাত্ত্বিক বিবর্তনের একটি ধারা। বাস্তুর দিক থেকে নীতিশাস্ত্র হল অস্তিত্বের সংগ্রামে স্বাধীন আচরণের

ওপর এক বিশেষ ধরনের নিয়ন্ত্রণ। আমরা যাকে নীতিশাস্ত্র বলি, তার উৎস পরস্পর নির্ভর ব্যক্তিসমূহ বা গোষ্ঠীগুলির পরস্পরের সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে আসে। বাস্তবাদীরা একেই মিথোজীবিতা বলেন।

পরিবেশ নীতিবিদ্যা হল দর্শনের এমন একটি শাখা, যা মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে নৈতিক সম্পর্কের প্রকৃতি ও সীমা নির্ধারণের চেষ্টা করে। এটি মূলত প্রশ্ন তোলে— মানুষের নৈতিক দায়িত্ব কি কেবল মানুষের প্রতিই সীমাবদ্ধ, নাকি তা সমগ্র জীবজগত ও প্রকৃতির প্রতিও প্রসারিত? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই পরিবেশ নীতিবিদ্যার উদ্ভব এবং বিকাশ ঘটে। পরিবেশ নীতিবিদ্যা বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত হয়ে ওঠে, যেমন— মানবকেন্দ্রিকতাবাদ, প্রাণকেন্দ্রিকতাবাদ, এবং বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদ। মানবকেন্দ্রিকতাবাদ মানুষকে নৈতিকতার কেন্দ্রস্থলে রাখে, যেখানে প্রাণকেন্দ্রিকতাবাদ সমস্ত জীবের সমান নৈতিক মর্যাদা স্বীকার করে। অন্যদিকে, বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদ জীব ও অজীব উভয় উপাদানসহ সমগ্র বাস্তুতন্ত্রকে নৈতিক বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করে। লিওপোল্ডের মতে, নীতিশাস্ত্রের যে বিবর্তন হয়েছে, তাতে ব্যক্তি আসলে পরস্পর নির্ভর অংশ নিয়ে তৈরী একটি সম্প্রদায়ের সদস্য। তার এই ভূমিনীতিতত্ত্বে ভূমির সকল সদস্যকে একই সম্প্রদায়ের সদস্য হিসাবে বিচার করে। এখানে ভূমি বলতে তিনি কেবল পৃথিবী গ্রহের স্থলভাগের উপরিভাগকে বোঝাননি। সমগ্র বিশ্ব, যেমন- মৃত্তিকা, জল, গাছপালা, প্রাণীকুল সকলকেই বুঝিয়েছেন। আমরা এতোদিন গাছপালা, প্রাণীকুলের প্রতি আমাদের কোনো দায়বদ্ধতা দেখাইনি। ভূমিনীতিবিদ্যা অনুসারে, এইসব বিষয়কে কেবলমাত্র প্রয়োজনের সামগ্রী হিসাবে দেখার বিরোধিতা করে এবং এদের অবিরাম অস্তিত্বের অধিকারের কথা বলেন। লিওপোল্ডের মতে, "In short, a land ethic changes the role of Homo sapiens from conqueror of the land-community to plain member and citizen of it. It implies respect for his fellow-members, and also respect for the community as such."[1]

এই নীতিতত্ত্বে মানুষকে প্রাণমন্ডলের সমান মর্যাদাসম্পন্ন সদস্য হিসাবে বিচার করা হয়। বাস্তুতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অনুসারে, যে ঘটনাগুলিকে মানুষের ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেগুলি হল মানুষের সাথে ভূমির পারস্পরিক মিথোজীবিতার সম্পর্ক। এখানে বলা হয়, যদি ঐ উপত্যকায় গাছপালা, জলবায়ু-আবহাওয়া অন্যরকম হত, তাহলে প্রকৃতি অন্যরকম হতে পারত। লিওপোল্ডের মতেও ভূমির শক্তিশৃঙ্খল, পরম্পরা গতিকে পরিচালিত করে। তাঁর মতে, ভূমি নীতিতত্ত্বকে বুঝতে হলে ভূমিকে বায়োটিক মেকানিজম হিসাবে ভাবতে হবে। ভূমিকে কেবল মৃত্তিকারূপে জড় বস্তু হিসাবে না দেখে, তাকে প্রাণমণ্ডলের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে দেখতে হবে। বাস্তুবিদ্যায়, ভূমির যে চিত্রটি সাধারণভাবে ব্যবহার করা হয় তাহল প্রাণমন্ডলের পিরামিড - এই পিরামিডকেই তিনি ভূমি- প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা মূলত মানবকেন্দ্রিক, কিন্তু পরিবেশ-নীতিবিদ্যা সেইরকমভাবে মানবকেন্দ্রিক নয়। আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যাকে মানবকেন্দ্রিক বলার কারণ হল- এই নীতিবিদ্যায় কেবল মানুষেরই একমাত্র স্বগতঃ মূল্য আছে। পরিবেশ নীতিবিদ্যা এখানে এই বিচারধারা থেকে আলাদা। মানবহীন প্রকৃতি-পরিবেশেরও স্বগতমূল্য আছে বলে মনে করা হয়। এখানেই আমাদের প্রশ্ন ওঠে যে, প্রাকৃতিক পরিবেশের কতটা অংশকে স্বতঃমূল্যবান বলতে পারবো এবং তা কিসের জন্য? একদল পরিবেশবাদী নীতিদার্শনিক বলেন যে, প্রকৃতিতে স্বগতমূল্য আরোপ করার ক্ষেত্রে একমাত্র মাপকাঠি হল- বোধসম্পন্নতা। বোধসম্পন্নতা, বলতে এখানে সুখ-দুঃখবোধের সক্ষমতাকে বোঝানো হয়েছে। এখানে বলা যায়, মানুষ ছাড়া জীবমন্ডলের একমাত্র পশুরাই হল

[1]Aldo Leopold,A Sand County Almanac And Sketches Here And There (Oxford University Press,1949), Page: 204.

স্বতঃ মূল্যের অধিকারী। আবার, অন্য একদল পরিবেশবাদী বোধসম্পন্নতাকে স্বগতমূল্য আরোপের মাপকাঠি হিসাবে ধরতে স্বীকার করেন না। এদের মতে, বৃদ্ধি, বিস্তার, সম্প্রসারণ এগুলো হল কোনো কিছুর স্বগতমূল্য থাকার প্রমাণ। যা কিছুর বৃদ্ধি হয়, পরিবর্ধিত হয়, সম্প্রসারিত হয়, বিকশিত হয় তাই এরা স্বতঃমূল্যবান বলে মনে করেন। তাই বিশ্বের প্রতিটি প্রজাতির অধিকারভেদ স্বীকার করতে হবে। আমরা যাকে পরিবেশ বিজ্ঞানের ভাষায় বাস্তুতন্ত্র বলি, যেমন- জল, মাটি, বাতাস, গাছপালা, পশুপাখি পরিবেশচক্রকেও নৈতিক অধিকার দিতে হবে। এই বাস্তুতন্ত্রে প্রত্যেক সত্ত্বাই এক মিথোজীবিতার সম্পর্কে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। মানুষের ক্রিয়াকর্মের জন্যই এই ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। পরিবেশ নীতিবিদ্যার আলোকে গভীর বাস্তবাদ কিভাবে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মূল্য প্রতিষ্ঠা করে?

গভীর বাস্তবাদ কেবল পরিবেশ রক্ষার জন্য ব্যবহারিক পদক্ষেপের উপর জোর দেয় না, বরং মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের মৌলিক পরিবর্তনের আহ্বান জানায়। সুতরাং, পরিবেশ নীতিবিদ্যার বিকাশ একটি ধারাবাহিক দার্শনিক বিবর্তনের ফল, যা মানুষকেন্দ্রিক চিন্তাধারা থেকে সরে এসে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মূল্য ও সামগ্রিক বাস্তুতন্ত্রের প্রতি নৈতিক দায়িত্বকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। গভীর বাস্তবাদ পরিবেশ নীতিবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক ধারা, যা মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ককে একেবারে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করে। এর প্রবর্তক আর্ণে নেস ১৯৭০-এর দশকে এই তত্ত্বটি উপস্থাপন করেন। তিনি অগভীর বাস্তবাদ ও গভীর বাস্তবাদ এর মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরে দেখান যে, অগভীর বাস্তবাদ কেবলমাত্র পরিবেশ সংরক্ষণকে মানুষের স্বার্থে সীমাবদ্ধ রাখে, কিন্তু গভীর বাস্তবাদ প্রকৃতির নিজস্ব মূল্য ও মর্যাদাকে স্বীকৃতি দেয়। গভীর বাস্তবাদ জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বের উপর জোর দেয়। বিভিন্ন প্রজাতি, বাস্তুতন্ত্র এবং প্রাকৃতিক উপাদানের বৈচিত্র্য শুধু পরিবেশগত ভারসাম্যের জন্যই নয়, বরং নিজস্ব মূল্য বহন করে। এই বৈচিত্র্য ধ্বংস করা মানে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মূল্যকে অস্বীকার করা।

নরওয়ের অস্‌লো বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক আর্ণে নেস্ তাঁর প্রবন্ধ 'The shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement'- এর মাধ্যমে বাস্তুতত্ত্বের গবেষনায় পরিবর্তনশীল প্রকৃতির ধারণা সামনে আনেন। এই পরিবর্তনশীল প্রকৃতির ধারণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমকালীন পরিবেশ দর্শনে সে তত্ত্বটিকে আমরা জানতে পারি, তাকেই গভীর বাস্তুতত্ত্ব বলে। এই গভীর বাস্তবাদের মূল প্রবক্তা হলেন- আর্ণে নেস্। গভীর বাস্তবাদের মূলত দুটি লক্ষ্য, একটি হল জীবমণ্ডলগত সমতাবাদের ধারণাকে উৎসাহিত করা এবং নীতিভাবনায় মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে তৈরী করা। একটি বাস্তুতন্ত্রে পারস্পরিক নির্ভরতার যে ছবি আমরা দেখতে পাই, যে সত্তাকুলের ধারণা পাই, তাকে বিশ্লেষন করলে আমরা বুঝতে পারব, এই জগত মানুষ-প্রাণী-গাছপালা-পাহাড়-পর্বত-নদী ইত্যাদি সব কিছুর ভারসাম্যের ওপর নির্ভর করে। পরিবেশ নীতিবিদ্যার দিক থেকে একটি প্রশ্ন হল- ব্যক্তি-অঙ্গতন্ত্র এবং প্রজাতিতন্ত্রের মত বাস্তুতন্ত্র-এরও নিজস্ব একটি আদর্শমুখী পরিচয় আছে কিনা? নেস্-এর কাছে গভীর বাস্তবাদ শুধুমাত্র একটি নীতিতত্ত্ব নয়, এটি তাঁর কাছে একটি সচেতনমূলক আন্দোলন। এই বাস্তুকেন্দ্রিক সমতাবাদ ও পারস্পরিকতার অধিবিদ্যার উপর গভীর বাস্তবাদ দাড়িয়ে আছে। এই প্রবন্ধে অধ্যাপক নেস্ গভীর বাস্তবাদকে, অগভীর বাস্তবাদ থেকে আলাদা করেন। সমকালীন পরিবেশকে ধ্বংস করা, পরিবেশ দূষন দেশের মানুষজনকে কিভাবে প্রভাবিত করছে এবং তার থেকে মুক্তির উপায় কি?

গভীর বাস্তবাদ বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে মানুষ- এই পরিবেশভাবনাকে বর্জন করে পারস্পরিক সম্বন্ধমূলক সামগ্রিকতার ধারনাকে গ্রহন করে। গভীর বাস্তবাদ অনুসারে, এই প্রকৃতির প্রতিটি ব্যক্তিসত্তার স্বগতমূল্য রয়েছে এবং তারা একে অপরের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সম্বন্ধে সম্পর্কিত। এই সম্পর্কটি একটি জটিল জালের

মতো। এই সমগ্রতাবাদী বিশ্বে প্রচলিত প্রজাতিবাদী মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে অসার প্রতিপন্ন করে। একই সাথে প্রকৃতিকে কেবল মানুষের প্রয়োজনের সামগ্রী হিসাবে বিচার করার বিরোধিতা করে। জীবকূলের প্রতিটি সদস্যের নিজের মতো করে বেড়ে ওঠার অধিকার আছে- এই সত্যকে গভীর বাস্তবাদ মান্যতা দেয়। এই সমতাবাদের সমর্থনে গভীর বাস্তবাদের বক্তব্য হল, মূল্যের স্রষ্টা কেবল মানুষ নয়। প্রতিটি সত্তা স্বগতভাবে মূল্যবান। এখানে কেউ ছোটো, কেউ বড় নয়, কেউ রাজা, কেউ প্রজা নয়- সকলেই সমান। যদিও এই সমতাবাদী নীতি বাস্তবে মেনে চলা কঠিন, তাই নেস্, নীতিগতভাবে 'biospherical egalitarianism, in principle'[2]- এর কথা বলেছেন। তিনি স্বীকার করেন যে, কিছু ক্ষেত্রে প্রাণী হত্যা ইত্যাদি অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে কিন্তু আমাদের সামান্য প্রয়োজনে প্রাণীর স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকার অধিকারকে কেড়ে নেওয়া যাবে না। আর্ণে নেসের এই গভীর বাস্তবাদ বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, বিশেষ করে আট ও নয়ের দশকে পরিবেশ চিন্তার জগতে ব্যাপক সাড়া দিয়েছে। অনেক চিন্তাবিদ এই গভীর বাস্তবাদের পরিবেশবাদকে সমর্থন করেন। নেস্ গভীর বাস্তবাদের কোনো সংজ্ঞা না দিয়ে একগুচ্ছ পরিবেশনীতির প্রস্তাব আলোচনা করেছেন। তিনি মোট আটটি নীতির কথা আলোচনা করেছেন। এই নীতিগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল-

ক) এই পৃথিবীতে মানব ও অমানব প্রাণীর নিজস্ব মূল্য আছে যাকে আমরা স্বগতমূল্য বলি। এই মূল্য সকল মানুষের জন্য অ-মানব প্রকৃতির ব্যবহার-নিরপেক্ষ।

খ) বহু প্রাণের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য এইসব মূল্যের উপলব্ধিতে সহায়ক হয়। শুধু তাই নয়, এগুলি স্বগতভাবেও মূল্যবান।

গ) মৌলিক প্রয়োজন ছাড়া এই প্রাচুর্য্য তথা বৈচিত্র্যকে নষ্ট করার কোনো অধিকার মানুষের নেই।

ঘ) মানুষের জনসংখ্যা বড় মাপের হ্রাসের সঙ্গে জীবনের গুণগত মানোন্নয়ন সঙ্গতিপূর্ণ। অ-মানব প্রাণীর স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্যও তা প্রয়োজন।

ঙ) মনুষ্যেতর জগতের উপর মানুষের হস্তক্ষেপ বর্তমানে বেড়ে গেছে এবং এই পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে।

চ) সাধারণ কর্মনীতিকে তাই অবশ্যই বদলাতে হবে। এই বদল আমাদের অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং মতাদর্শগত মৌলিক চিন্তাকাঠামোয় পরিবর্তন আনবে।

ছ) মতাদর্শগত পরিবর্তন স্বগতমূল্যবান জীবনের গুণগত মানকে অনুধাবন করতে সাহায্য করবে এবং তা তথাকথিত ভোগের পরিমাণের ভাষায় জীবনের উচ্চমানের ধারণাকে পাল্টে দেবে।

জ) যারা উপরের এই নীতিগুচ্ছকে স্বীকার করেন, তাদের উপর একটা নৈতিক দায় বর্তায় যে তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আবশ্যিক পরিবর্তনগুলি বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে।

গভীর ও অ-গভীর বাস্তবাদ: আর্নে নেস্ গভীর ও অ-গভীর বাস্তবাদের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করেছেন। নীতিবিদ্যার এই ভাষ্য মানুষের সঙ্গে ভূমি এবং অমানবপ্রাণী ও উদ্ভিদের সম্পর্কের ওপরে আলোকপাত করে। ১৯৪৯ সালে অল্ডো লিওপোল্ড তাঁর 'The Land Ethic'- প্রবন্ধে ভূমি নীতিবিদ্যা কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন। তাকেই ভুমি নীতিবিদ্যার জনক বলা হয়। তারপর আর্ণে নেস্ ১৯৭৬ সালে একটি প্রবন্ধে গভীর ও অ-গভীর বাস্তবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করেন। বাস্তুসংস্থানকে যারা অ-গভীর অর্থে গ্রহন করেন,

[2] Arne Naess,The Shallow and the Deep,Long-Range Ecology Movement.A Summary(University of Oslo,1972), Page:95.

তাঁরা নৈতিকভাবে মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে সমর্থন করেন এবং মানুষের স্বার্থ চিন্তা করেই বলেন যে, নিঃস্বাস নেবার জন্য বায়ু, পিপাসা নিবারনের জন্য জল যদি দুষিত হয়, তাহলে মানুষের ক্ষতিসাধন হবে।

অপরদিকে, গভীর বাস্তবাদীরা জীবমন্ডলের স্বার্থেই প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করতে আগ্রহী। জীবমন্ডলের এই অখণ্ডতা মানুষের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবে কিনা সে ব্যাপারে তাদের কোনো চিন্তা নেই। জীবিত ব্যক্তিসত্তার উপর জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা গুরুত্ব আরোপ করে, সেখানে বাস্তবাদীরা পরিবেশের মধ্যে প্রজাতি এবং সামগ্রিকভাবে জীবমণ্ডলকেও যুক্ত করতে চান। পল্ টেলরের মতে, অমানব প্রাণীদের শ্রদ্ধা করার সাথে সাথে আমাদের উচিত অন্যান্য আরোও সকল প্রাণের জীবনের নৈতিক মূল্য প্রদান করা।

গভীর ও অগভীর বাস্তবাদের মধ্যে যে পার্থক্য তা বাস্তবে আমাদের বিভিন্নধরনের অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক কর্মনীতি সম্পর্কে এক গভীর প্রশ্ন আমাদের মনে জাগিয়ে তোলে। মানবকেন্দ্রিক ভাবনাকে বর্জন করার কথা এই গভীর বাস্তবাদ বলেন। শুধু তাই নয়, মানুষের যুক্তিতর্ক প্রয়োজনীয় সামাজিক জীবনকে পরিবর্তনের উদ্যোগকে দুর্বল করে দেয়। প্রকৃত বাস্তবাদী দার্শনিকরা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে পরিবেশ রক্ষার জন্য সবকিছুকে বিচার করে পরিবেশের নীতিগুলিকে প্রয়োগ করে। গভীর বাস্তবাদে সামাজিক এবং রাজনৈতিক চিন্তার কথা বলে, কিন্তু তারপরেও এর কিছু গভীর দার্শনিক সত্তা আছে। এই আন্দোলনের সাথে যারা যুক্ত তাদের কেউ খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে, কেউ বা বৌদ্ধদর্শনের মধ্যে এই বাস্তুতাত্ত্বিক নিয়ম-নীতিগুলির সন্ধান করেছেন। নেসের এই বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি গভীর বাস্তবাদী আন্দোলনের বিকাশে সাহায্য করেছে।

নেসের Ecosophy-T

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের অনুভব ও ঐতিহ্যের মধ্য থেকে নিজের বাস্তুদর্শনকে খুঁজে পেয়ে থাকেন। দার্শনিক আর্ণে নেসের মতে, প্রকৃতির সাথে মানুষের গভীর আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক সংযোগের একটি ব্যক্তিগত দর্শন হল- এই Ecosophy-T. এটি গভীর বাস্তবাদের আন্দোলনের মূল ভিত্তি। যা প্রকৃতিকে কেবল মানুষের ব্যবহারের বস্তু হিসাবে না দেখে, প্রকৃতিতে সকল জীবের সমানভাবে বাঁচার অধিকার আছে এবং প্রকৃতি আত্ম-উপলব্ধির ওপর বেশি জোর দেয়। এর মূল কথা হল, বাস্তুতাত্ত্বিক আত্মোপলব্ধি, যা গভীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। এর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য নিম্নে আলোচনা করা হল

i) আত্ম-উপলব্ধি: নেস বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ যখন প্রকৃতির অংশ হিসাবে নিজেকে বুঝতে পারে, তখন পরিবেশের যত্ন নেওয়া তার কাছে একটি স্বাভাবিক আচরনের মতো হয়ে ওঠে।
ii) জৈবমন্ডলীর সমতাবাদ: সব জীবের, তা সে মানুষ হোক বা অনুজীব, বেঁচে থাকার, এবং বিকশিত হওয়ার সমান অধিকার রয়েছে।
iii) সাধারন জীবনযাপন: এটি ভোগবাদ কমিয়ে পরিবেশের উপযোগী এবং সরল জীবনযাপন করার পরামর্শ দেয়।
iv) ব্যক্তিগত দর্শন: এটি ব্যক্তিবিশেষে আলাদা আলাদা মতামত স্থাপন করে, নেসের মতে, প্রত্যেকেরই নিজস্ব ইকোসফি তৈরী করা উচিত।

তবে নেসের মতে, এই Ecosophy-T- এর চরম আদর্শকে আমরা একটি সূত্রে স্থাপন করতে পারি এবং সেটি হল- আত্মোপলব্ধি। এই কথাটিকে নেস সংকীর্ণ অহমের ব্যক্তিগত অর্থে বোঝাননি। ভারতীয় দর্শনে যে পরমাত্মা- জীবাত্মার ধারনা আছে, নেস তারই উল্লেখ করে পরমাত্মার উপলব্ধির কথা বলেছেন। নেস্ তাঁর গভীর বাস্তুদর্শনের কেন্দ্রবিন্দুরূপে প্রকাশ করেছেন এই আত্মোপলব্ধিকে। এই আত্মোপলব্ধির দ্বারা শুধুমাত্র আমাদের আত্মীয় বা পরিবার-পরিজনের সাথে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ অনুভব করাই যথেষ্ট নয়, এই বাস্তুতন্ত্রে

সে সমস্ত অমানবপ্রাণী, নদী, পাহাড়, জঙ্গল ইত্যাদি রয়েছে তাদের সকলের সাথে আমরা এক অভিন্নতার সম্বন্ধে যুক্ত। এই প্রকৃতিমুখী আত্মাই প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল।

মানুষ নিজেকে কেবল একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে না দেখে বরং প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে উপলব্ধি করে। আর্ণে নেসের মতে, এই আত্মোপলব্ধি এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে মানুষ তার সীমাবদ্ধ ব্যক্তিসত্তা অতিক্রম করে প্রকৃতির সাথে একাত্মতা উপলব্ধি করে। এই উপলব্ধিই গভীর বাস্তুতন্ত্রের প্রতি প্রকৃতির স্বগতমূল্য প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি। প্রকৃতির ক্ষতি করা মানে নিজের ক্ষতি করা- এই নৈতিক উপলব্ধি স্বতঃসিদ্ধ হয়ে ওঠে, এই দৃষ্টিভঙ্গি মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে প্রত্যাখ্যান করে। প্রকৃতিকে কেবল উপযোগিতার ভিত্তিতে নয় বরং নিজস্ব অস্তিত্বের কারনেই, মূল্যবান হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। সুতরাং, এই আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে এই গভীর বাস্তবাদ এমন এক নৈতিক কাঠামো নির্মান করে, যেখানে পরিবেশ সংরক্ষণ কোনো বাহ্যিক কর্তব্য নয় বরং আত্মোপলব্ধির একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

অনুসিদ্ধান্ত: গভীর বাস্তবাদ মানবকেন্দ্রিকতাবাদের বিরোধিতা করে এবং প্রাণকেন্দ্রিকতাবাদ ও বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদের পক্ষে যুক্তি দেয়। এটি জীবের সমানাধিকার এবং আত্মোপলবদ্ধি ধারণার মাধ্যমে মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে আহ্বান জানায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, প্রকৃতির প্রতি নৈতিক দায়িত্ব শুধুমাত্র মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য নয়, বরং সমস্ত জীবের অস্তিত্ব ও বিকাশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। নেস্ তাঁর গভীর বাস্তবাদের আলোচনায় নিজস্ব Ecosophy কে প্রতিষ্ঠা করেছেন উদার এবং সমগ্রতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে। এই গভীর বাস্তবাদ বর্তমান পরিবেশ সঙ্কট সম্পর্কে আমাদের চিরাচরিত সমাজব্যবস্থার কোন সংস্করণ নয়, গভীরভাবে পুনর্বিন্যাসের নির্দেশ দেয়। তাঁর এই আদর্শই এই জগতে মানব এবং অমানব সকল প্রাণীর জীবনযাপনের চাবিকাঠি। বর্তমান সময়ে মানব এবং অমানব প্রাণীদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ এই জগতের অন্যান্য প্রজাতির মতই একটি প্রজাতিমাত্র। এই আত্মোপলব্ধিই মানুষকে সঠিক দিকদর্শন করাতে পারে। মানুষ যদি বুঝতে পারে যে, এই প্রাণীরা তাদের শত্রু নয় বরং তারা একে অন্যের সাথে অভিন্ন, তাদের মধ্যে একজনের ক্ষতি হলে তার প্রভাব অন্যের ওপরেও পড়বে, তাহলে এই পারস্পরিক লড়াই, হিংসা, ক্ষতি করার প্রবণতা ইত্যাদির বিনাশপ্রাপ্ত হবে। মনুষ্য জনসংখ্যার কারণেই অমানব প্রাণীরা আজ বিপন্ন। তিনি অমানব প্রাণীদের নৈতিক বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করতে গিয়ে মানুষের মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করেননি।

মানুষের কিছু মৌলিক চাহিদার জন্য কখনো কখনো প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন হতে পারে। তথাপি আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই জগতে মানব এবং অমানব সকল সত্তাই একে অপরের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে যুক্ত। সেখানে কোন একটি প্রজাতির ক্ষতি হলে তা সকল প্রজাতিকেই কোন না কোন ভাবে প্রভাবিত করবে। সুতরাং, বাস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবেশের বৈচিত্র্য এবং ভারসাম্য রক্ষা করার একমাত্র উপায়। নেস্ এমন একটি মতাদর্শের কথা বলেন, যেখানে জগতের এই সকল উপাদানের মধ্যে কোন উচ্চ নিচ স্তরভেদ নেই, সকলেই সমান। ব্যক্তিগত আত্মানুসন্ধান নয় বরং আত্মোপলব্ধি এবং জগতে মানব ও অমানব সমস্ত প্রাণীর সাথে একাত্মতাই হল আদর্শ নীতিদর্শন। আমাদেরকে এই সমগ্র জগতের বাস্তুতন্ত্র যেমন- গাছপালা, নদী, উপত্যকা, পাহাড়-পর্বতের সাথে অভিন্ন হতে হবে।

সহায়ক গ্রন্থ:

1. Leopold, A. (1949). *A Sand Country Almanc and Sketches Here and There*. New York: Oxford University Press.
2. Taylor, P. W. (1981). The Ethics of Respect for Nature.
3. white, L. (1967). The Historical Roots of our Ecological Crisis. In Science 155:
4. Frey, R. G. (1987). Moral standing, The value of Lives, and Speciesism.
5. Naess, A. (1989). Ecology, community and lifestyle (1st ed.). Cambridge University Press.
6. Naess, A. (1986). The Deep Ecological Movement: Some Philosophical Aspects, In Philosophy Inquiry.
7. Naess, A. (1972). The shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement. A summary. University of Oslo.
8. Pal. S.K. (2021). Falito Niti sastra (1st Part). Levant Books, India.
9. Routley, R. (1973). Is there a need for a new, an Environmental Ethic?. Bulgaria: Sofia Press.
10. Leopold, A. (1949). The Land Ethic from A sand County Almanac.
11. Chakraborty, N.N. (2021). Paribesh o Nitibidya (2nd ed.). west Bengal state Book board.
12. Chakraborty, Somnath. (2020). Kothay karme ethics. Progressive publishers, Kolkata.
13. Sarkar, Swapna. (2022). Nitibidya: falito poribesh o adhinitibidya. Mitram, Kolkata.